আর্সেনিকের বিষক্রিয়া চলছেই

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

নদীয়ার এক নামী কলেজে 'নিরাপদ পানীয় জল' এর সেমিনারে কিছুদিন আগে বক্তৃতার পর লাঞ্চে যাবার পথে সলজ্জ হাসি নিয়ে এক ছাত্রী আমার কাছে জানতে চাইল কদিন আগে এক নামী বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে যে বড় খবর বেরিয়েছে, তা কতটা ঠিক? খবরটা আমিও পড়েছিলাম; তার শিরোনাম ছিল 'মা আর্সেনিক-জল খেলে দূষণ হবে শিশুর জিনেও।' খবরটা আমার ই-মেলেও এসেছিল। তাতে বলা হয়েছে গর্ভবতী মহিলা আর্সেনিক দুষ্ট জল খেলে তা থেকে আর্সেনিক গর্ভফুল (প্লাসেন্ট) অতিক্রম করে গর্ভস্থ ভ্রূণের জিনগত পরিবর্তন আনে। আর ঐ পরিবর্তন শিশুর শরীরে ভবিষ্যতে ক্যানসার ও অন্যান্য রোগের সম্ভবনা সৃষ্টি করে। এমন কি ঐ শিশু জন্মের পর কখনো আর্সেনিক -দুষ্ট জল না খেলেও তার ক্যানসারের আশঙ্কা থেকেই যায়। সহানুভূতি নিয়ে আমি আনত মুখের তরুণীটিকে বললাম, যা পড়েছ, সে খবরটা ঠিক। মেয়েটির উদ্বেগ আমি বুঝতে পারলাম। সে আর্সেনিক অধ্যুষিত কৃষ্ণনগরের মেয়ে।

কোন মৌলের দূষণ যে এভাবে ভ্রূণের জিনগত পরিবর্তন আনতে পারে, এতদিন তা জানাই ছিল না। থাইল্যান্ডের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (MIT) তিনটি বিভাগের কয়েক বৎসর ব্যাপী যৌথ গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মা যে জল খাচ্ছেন তাতে লিটার প্রতি ০.০৫ মিলিগ্রামের বেশী আর্সেনিক থাকলে পরিবর্তন ঘটায়। বেশীরভাগ জিনই অতিসক্রিয় হয়ে যায়। যার ফল ভবিষ্যতের ক্যানসার। কোনওটা আবার নিষ্ক্রিয়ও হয়ে যায়। যেসব মহিলা গর্ভাবস্থায় আর্সেনিক-দুষ্ট জল খাচ্ছেন তাঁদের শিশুদের এমন ১১টি জিন মিলেছে যা অন্য শিশুদের দেহে নেই। এই জিনগুলি যেসব শিশুদের দেহে পাওয়া যায় তা থেকে নিশ্চিন্তভাবেই বলা যায় যে তাদের মায়েরা গর্ভাবস্থায় আর্সেনিক -দুষ্ট জল খেতেন। ইদুঁরের উপর পরীক্ষা থেকে বিষয়টি আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। ইদুঁরেরা সাময়িকভাবে আর্সেনিকে উন্মুক্ত হলেও বয়ঃকালে তাদের প্রজনিদের ভিতর বর্ধিত ক্যানসার প্রবণতা দেখা গেছে। এই ১১টি জিনকে আর্সেনিক উন্মুক্তির নির্ভরযোগ্য 'বায়োমার্কার' (জীবদেহে আর্সেনিকের পদচিহ্ন) বলে গণ্য করা যায়।

থাইল্যান্ডের আগের এক গবেষণা থেকে জানা যায় আর্সেনিকের উন্মুক্ত গর্ভবতী মহিলাদের অসুস্থ শিশুরা কম বুদ্ধি নিয়ে জন্মায়। থাইল্যান্ডের রনপিবুন জেলায় ৬ থেকে ৯ বছরের শিশুদের চুলের আর্সেনিক ভারের তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ) হ্রাসের সরকারি সম্পর্ক পাওয়া গেছে। চুলে যত বেশী আর্সেনিক বেড়েছে তার শিশুদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক লক্ষণীয়ভাবে কমেছে দেখা গেছে। বুদ্ধ্যঙ্ক মাপা হয়েছে ভেক্স্লার (Wechslar Scale)। সাধারণ বা গড় বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ Score 90-110) কমেছে ৫৬.৮ থেকে ৪০.০ শতাংশে; উজ্জ্বল স্বাভাবিক (Bright normal 110-120) কমেছে ৯.১ থেকে ৪.২ শতাংশে; হাবা স্বাভাবিক (dull normal 80-90) বেড়েছে ২২.৭ থেকে ৩৭.৯ শতাংশে; পগোঙ্ডু (Mentally retarded<80) বেড়েছে ০ থেকে ৬.০ শতাংশে। ১৯৮৬-১৯৮৯ সালের মধ্যে জন্মানো ৬ থেকে ৯ বছরের ৫২৯ জন শিশুর উপর দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে জলে আর্সেনিকের মাত্রা বুদ্ধ্যঙ্ক পার্থক্যের ১৪ শতাংশ ব্যাখ্যা করতেপারে। এই সমীক্ষায় অন্যান্য বিভ্রান্তিসমূহের (confounders) অবদানের মধ্যে লিহাবে রাখা হয়েচে বাবার পেশা, মায়ের বুদ্ধ্যঙ্ক স্কোপ, পারিবারিক উপার্যন, অসুখ-বিসুখের ইতিহাস ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক কবলিত ৯টি জেলার অনেক গ্রামেই পানীয় জলে আর্সেনিক মাত্রা থাইল্যান্ডের সমীক্ষিত অঞ্চলের জলের থেকে অনেক বেশী। দুই বাংলা এখন চিকিৎসা ও প্রাণবিজ্ঞান গবেষণার 'স্বর্ণক্ষেত্র'। আর্সেনিক আক্রান্ত এত মানুষ পৃথিবীর কোথায়ও কখনো দেখা যায়নি। এতদিন মফস্বল ও গ্রামাঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত পরিবারের বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী ছেলেমেয়েরা শহরে পড়তে এসে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছে। সে সব আর হবে না। দুই বাংলা আর 'নবজাতকের বাসযোগ্য' থাকবে না। এটা বামফ্রন্টের মহত্তম কীর্তি।

এতদিন পশ্চিমবাংলায় জলের আর্সেনিক দূষণকে সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতিই দেয়নি বামফ্রন্ট সরকার। নলকূপের জলে আর্সেনিক থেকে আর্সেনিক রোগের উদ্ভব, এই বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের চর্মরোগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার কে সি সাহা। এই আবিষ্কারের খবর ১৯৮৪ সালে কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে বামফ্রন্ট সরকার ডাক্তার সাহাকে ডেকে নিয়ে রীতিমত ধমক দেন। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, সরকারী কর্মচারী হিসাবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এইসব খবর তিনি বাইরে প্রকাশ করতে পারেন না। ১৯৮৭ সাল থেকে যাদবপুরের স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের ডঃ দীপঙ্কর চক্রবর্তী নলকূপের জলের আর্সেনিকমাত্রা পরিমাপ করে দুই বাংলায় আর্সেনিকঘটিত অসুখ বিসুখের ব্যাপকতা প্রকাশ করতে থাকেন। তিনিও সরকারের বিরাগভাজন হন। দেশে বিদেশে আরো অনেকেই এই বিষয়ে কাজ করলেও সরকার আর্সেনিক সমস্যাকে পাত্তা দেয়নি। অবশেষে ১৯৯৫ সালে যাদবপুরে যে 'আন্তর্জাতিক আর্সেনিক সম্মেলন' হয়, তার ফলে পশ্চিমবাংলার আর্সেনিক সমস্যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। তখন বামফ্রন্ট সরকারও সমস্যাটির সরকারি স্বীকৃতি দেন।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ততদিনে কয়েককোটি মানুষ দুই বাংলায় আর্সেনিক বিষের শিকার হয়ে যান। যার ফলশ্রুতি ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছেই। কম করে হলেও পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ ৫০ লক্ষ, আর বাংলাদেশে অন্ততঃ সাড়ে তিনকোটি মানুষ ৫০ পিপিবির (মানে প্রতি লিটার জলে ০.০৫ মিলিগ্রাম) বেশী মাত্রার আর্সেনিক মিশ্রিত জল পান করেছেন। আর্সেনিক একটি 'সিস্টেমিক' বা সর্বাঙ্গীক বিষ। সকলের দেহেই আর্সেনিক রোগলক্ষণ শুরু থেকেই দেখা যায় না। বহির্লক্ষণ না থাকলেও দেহের ভিতরে আর্সেনিক নানারকম গোলযোগ ঘটিয়েই চলে। যেমন : ডায়াবেটিস মেলিটাস, উচ্চরক্তচাপ, মুত্রাশয় ও ফুসফুসের ক্যানসার প্রভৃতি। আর্সেনিকঘটিত ক্যানসারের সুপ্তাবস্থা প্রায় ১০ বছর। সুতরাং আগামী দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ক্যানসারের মহামারী অনিবার্য। চিকিৎসক ও মানুষজন অসহায়। বাংলাদেশে এখনই প্রতি ১৫ মিনিটে একজন আর্সেনিকঘটিত ক্যানসারে মারা যাচ্ছেন। আর্সেনিকঘটিত অসুখ-বিসুখের কোন চিকিৎসা না থাকায় বাঁচবার একমাত্র পথ হল শরীরে আর্সেনিক প্রবেশ করতে না দেওয়া। অর্থাৎ পানীয়জল ও সেচের জল আর্সেনিকমুক্ত হতেই হবে।

এবারে দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গ সরকার গৃহীত নীতি ও আর্সেনিক নিবারণ মূলক কাজকর্মের গতি প্রকৃতি। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৭ সাল

পর্যন্ত সরকার, সেবামূলক কিছু প্রতিষ্ঠান ও কিছু কোম্পানী পশ্চিমবাংলার ৯টির মধ্যে ৫টি জেলায় প্রায় ২৪০০ আর্সেনিক দূরীকরণ যন্ত্র (Arsenice Removal Plants) বসিয়েছেন। খরচ হয়েছে অন্ততঃ ১৪-১৫ কোটি টাকা। কিছু কোম্পানী (দেশী ও বিদেশী) প্রচুর লাভ করেছেন। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণার তিনটি জেলায় বসানো ৫৭৭টি আর্সেনিক দূরীকরণ যন্ত্রের কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যর অগ্রগতি ও সাফল্য নিয়মিত পরীক্ষা করে গেছেন যাদবপুরের স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ দশ বৎসর ধরে (১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০৬-০৭)। তাতে দেখা গেছে স্থাপিত যন্ত্রসমূহের (যার প্রত্যেকটির দাম গড়ে ১৫০০ আমেরিকান ডলার) আশি শতাংশের বেশীই অকেজো হয়ে গেছে স্থাপনার কিছুদিনের মধ্যেই। তারা না পেরেয়ে দীর্ঘদিন জলের আর্সেনিকভার কম রাখতে, না পেরেছে তাদের দীর্ঘদিন সচল রাখতে। জনসাধারণ (স্পষ্টতঃ তা সামান্যই) কিছুদিন কম আর্সেনিক জল পেয়েছেন ঠিকই, তারপর অবহেলা। আর্সেনিক দূরীকারক রাহায়নিক দ্রব্যাদির নবীকরণাদি না হওয়ায় বেশীরভাগ জায়গায় তাদের অচল ও অব্যবহৃত থাকার চিত্রই প্রায় সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। কোথাও লোকে সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে গেছে, কোথাও ভিন্ন কাজে বা বাচ্চাদের খেলার বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরো ভয়ঙ্কর কথা যতদিন সেগুলি চলেছিল, সেখানে উত্তোলিত জল থেকে সরানো আর্সেনিক বিষাক্ত বর্জ্যের 'স্লাজ" নিকটবর্তী মাঠে বা পুকুরে ফেলা হত। অথচ আর্সেনিকের এই বিষাক্ত বর্জ্য তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের মতই ভয় ও সমীহ পাবার যোগ্য।

২০০১ সালে আগষ্ট মাস থেকে দক্ষিণ ২৪-পরগণার বারুইপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কানাডার আর্থিক সাহায্যে আর্সেনিকমুক্ত জল সরবরাহের জন্য সগর্বে একটি 'টেকনোলজি পার্ক' গড়ে, তোলেন, সেখান ১১টি কোম্পানীর, বিভিন্ন সংস্থার ১৮টি আর্সেনিক দূরীকরণ যন্ত্র (ARPs) বসিয়েছিলেন। তাদের দুটো যন্ত্র কিছুদিন আর্সেনিক মুক্ত জল দিতে পেরেছিল। ২০০৭ সালের মে মাস থেকে সব যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। গেল কত কোটি টাকা! নিয়মিত তদারক, পরিচর্যার অভাবই বড় কারণ। অবশ্য জনসাধারণের অজ্ঞাত, দায়িত্বহীনতাও এই বিপুল ব্যর্থতায় কিছু অবদান রেখেছিল। আর্সেনিক আক্রান্ত জনসাধারণ যে তিমিরে, সেই তিমিরেই, অদৃশ্য চুপিসারে আর্সেনিক তার বিষক্রিয়া কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেই, যার ধীর অনিবার্য পরিণতি বাঙালি জাতির ক্রমাবিলুপ্তি। মানুষের উদ্বেগ ও ভীতি যত বেড়েছে ততই কোম্পানীগুলির লাভের ব্যবসা বেড়ে গেছে। এইসব যন্ত্রপাতি, আর্সেনিক পরিমাপের 'কিট' ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির বাজার হিসাব করে দেখেছে ভারতে (মানে পশ্চিমবঙ্গে) তাদের সম্ভাব্য বাজার বর্তমানে প্রায় দুশো মিলিয়ন আমেরিকান ডলার অর্থাৎ প্রায় আটশো কোটি টাকা। অথচ এইসব প্রযুক্তি না দিতে পারে দীর্ঘস্থায়ী ও সামগ্রিক সমাধান, না পারে সেচের জন্য আর্সেনিক মুক্ত জল। আর বিষাক্ত আর্সেনিক বর্জ্য নিস্পত্তির সন্তোষজনক সমাধান তো আজও অধরা থেকেই যাচ্ছে। যাবেও। সরকারী নীতিই এবিষয়ে মুখ্যতঃ দায়ী।

আর্সেনিক সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সুষ্ঠু সমাধানের অন্যতম উপায়ের একটি হল বেশী বেশী করে ভূতল জল (surface water) ব্যবহার। বাংলার ভূগোল, জলবায়ুর ইতিহাসই হল বর্ষার চারমাসের জল লক্ষ লক্ষ পুকুর দীঘি সরোবরাদিতে সংগ্রহ করে রেখে সারা বছর চালানো। সংস্কার করা মজানদী, খালবিলে জল সংগ্রহ করে, জীবাণু মুক্ত করে পানীয় জল সরবরাহ করতে পারলে আর্সেনিক সমস্যার সুন্দর সুষ্ঠু স্থায়ী সমাধান হয়। পশ্চিমবাংলায় পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের সংখ্যা, আয়তন, গভীরতা সম্পর্কিত তথ্যাদি সরকার গোপন রেখেছেন। লেখক বহু চেষ্টা করেও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর থেকে তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছেন। নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে জানতে পারছি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বার লক্ষ জলাশয় আছে, যার মোট আয়তন চার হাজার বর্গ কিমি, গড় গভীরতা ২.৩ মিটার। বাংলাদেশে পুকুরের সংখ্যা আরও বেশী, প্রায় এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ (প্রতি পুকুরের গড় আয়তন ০.১১৪ হেক্টর) । মোট আয়তন পনের হাজার বর্গকিমি। অন্য পশ্চিমবঙ্গে সাত হাজার কিউবিক মিটার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহরের উন্নয়নের জন্য দেদার টাকা খরচ করেছেন, রাস্তাঘাট, উপনগরীর, শিল্পাঞ্চল প্রভৃতির জন্য আইন-বে আইনী সবভাবেই মানুষকে জীবন ও জীবিকাচ্যুত করেও জমি অধিগ্রহণ করেছে। আর পুকুর, দীঘি, জলাশয়গুলি অধিগ্রহণ ও সংস্কার করে জল সংরক্ষণের কথা উঠলেই তাঁরা আইনের বাধা ও অন্যান্য অসুবিধার কথা বলেন। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে আর্সেনিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। গণ-আন্দোলন ছাড়া উপায় দেখা যায় না।

অন্যদিকে আবার কিছু বিজ্ঞান-প্রযুক্তিও সম্ভব যা সরকার ও তাঁদের বিশেষজ্ঞরা ভাবেন না, জানেননা ও জানবার চেষ্টাও বোধহয় দেখা যায় না। যেমন, কলকাতার ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষণ (GSI) এর বিজ্ঞানীরা দেখেছেন (Current Science: 10 Jan, 2008) মাটির প্রায় ৪০-৫০ নিটার নীচে যেসব জায়গায় কমলা রঙের বালি আছে, সেইসব জায়গায় ৫-১০ মিটার প্রশস্ত আবদ্ধ ভূসলিলাধার (confined aquifer) আছে। সেখানে নলকূপ বসিয়ে অনায়াসে আর্সেনিকমুক্ত জল পাওয়া যেতে পারে। কলকাতার ভূবিজ্ঞানীরা নদীয়ার আর্সেনিক পীড়িত চাকদহ ব্লকের প্রত্যন্ত গোটরা ও ঘেটুগাছিতে চারটি কমলাবালির অ্যাকুইফারে নলকূল বসিয়ে আর্সেনিকমুক্ত জলোত্তলনের ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছেন। চারটি গ্রাম হল : মাঠপাড়া, বাগপাড়া, ঘোষপাড়া, ধর্মতলা। কলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিক কিছুদিন আগে এই নিয়ে একটা বড় খবর বেরিয়েছে যার শিরোনামা হল Arsenic-free Water, At Last.

আর্সেনিক থেকে মানুষ ও জীবজগতকে বাঁচানোর আরো পদ্ধতি সম্ভব। ভূগর্ভে আর্সেনিক নিরাকরণ (Subterranean or In-Situ Removal of Arsenic) একটি ভূ রাসায়নিক পদ্ধতি, যাতে আর্সেনিক সহ নানা অপদ্রব্যাদি অ্যাকুইফারে আবদ্ধ রেখে বিশুদ্ধতর পল পাম্প করে উত্তোলন করা যায়। এই জল সাধারণতঃ জীবাণুমুক্ত, যা সরাসরি পাম্প করে পানীয় বা শিল্পজল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতিতে অ্যাকুইফারটিকে একটি প্রাকৃতিক বায়োকেমিক্যাল রিআকটর (Natural Biochemical Reactor) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নলকূপের পাইপের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে বাতাস বা অক্সিজেন প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলে আর্সেনিককে অ্যাকুইফারে আবদ্ধ রখে আর্সেনিকমুক্ত জল পাম্প করে তুলে সরবরাহ করা যায়। এ ব্যাপারে জার্মানীর স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বখ্যাত পথিকৃৎ; নেদারল্যান্ড ও আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে এই পদ্ধতিতে আর্সেনিক মুক্ত জল সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশেও এই প্রযুক্তির কিছু অগ্রগতি হয়েছে। অ্যাকুইফারে বিশেষ বিজারক পরিবেশে জীবানু মাধ্যমে আর্সেনেট বা তার পোষাক মাধ্যম ফেরিক আয়রণ বিজারিত হলেই আর্সেনিক বিমুক্ত হয় ও জহবাহিত হয়ে উপরে উঠে আসে। তাই জারকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ আর্সেনিক নিরাকরণে সবিশেষ কার্যকরী। পারম্যাঙ্গানেট, ওজোন, পেরোক্সাইড প্রভৃতিও সম্ভাব্য জারক নিবাকরক।

প্রকৃত উন্নয়নে আগ্রহী হলে সরকারকে আগে আর্সেনিক সমস্যার সমাধান করতে হলে। পুকুর, দীঘি, জলভূমিসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন হওয়া উচিত প্রাথমিক কর্তব্য। উদ্বিগ্ন নতমুখী যে তরুণীর প্রশ্ন এই লেখার প্রেরণা তার মত লক্ষ লক্ষ মেয়েদের, যারা মা হবার স্বপ্ন দেখে, তাদের কথা সবাই মনে রাখবেন, এই আমার নিবেদন।